প্রতিবাদী স্বর হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আর এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে কেবল মাত্র ''কোনি'' উপন্যাসকেই প্রধান সোর্স হিসেবে দেখানো হয়েছে।

বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক ও ঔপন্যাসিক মতি নন্দী রচিত 'কোনি' উপন্যাসে প্রান্তিক পরিবারের সন্তান কোনির গঙ্গায় একজন মেঠো সাঁতারু থেকে ভারত সেরা সাঁতারু হয়ে ওঠার এক রোমাঞ্চকর কাহিনি বর্ণিত আছে। কোনি ছিল নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের কন্যা, দিন আনা দিন খাওয়াই ছিল যার কাছে আনন্দের ব্যাপার, কেননা এদের নুন আনতে পান্তা ফুরাই অবস্থা। সুতরাং তার জীবনের সাথে দারিদ্র্য ও বঞ্চনা জড়িয়ে ছিল ওতপ্রোতভাবে। বেদনায় বিধুর কোনির জীবনে দারিদ্রই হয়ে উঠেছিল তার জীবনের সঙ্গী। আর এই জীবনের মধ্য দিয়েই নিজেকে মহানুভবতার পরিচয় দিয়ে তাঁর বিভিন্ন কাজের দ্বারা 'ইস্পাতের মেয়ে'তে পরিনত করেছিলেন। কবির কথায় — 'হে দারিদ্র, তুমি মোরে করেছ মহান", দরিদ্রতায় তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথকে সুদৃঢ় করেছিল। যেমন কিনা উপেনকে মাত্র দুই বিঘা জমির পরিবর্তে ঈশ্বর তাঁকে বিশ্ব অলিখিত ভাবে খুলে দিয়েছিলেন[1] । ঠিক তেমনি হইত কোনি দারিদ্র বলেই তাঁর পক্ষে একটি শক্ত, হার না মানা চরিত্র হিসেবে উঠে আসা সম্ভব হয়েছিল। কোনির দরিদ্র পরিবারে ছিল তার মা, তার দাদা কমল পাল, তার ছোট ভাই গোপাল এবং আরো দুই বোন। তার এক দাদা মারা গিয়েছে ইলেকট্রিক তারে কাটা পড়ে, অপর এক দাদা থাকে পিসির বাড়ি, কাঁচড়াপাড়ায় । দারিদ্র্যক্লিষ্ট কোনির সংসারে একমাত্র রোজগারের ব্যাক্তি ছিলেন ছিল কমল পাল, সে রাজাবাজারে মোটর গ্যারেজে কাজ করে[2] । এই সামান্য আয়ের উপর ভরসা করেই তাঁদের সংসার চলে, কোনির শৈশবের কুয়াশার আড়ালে বাবা হারিয়ে গেছে টি.বি. রোগে। কমলও আকস্মিকভাবে একই রোগে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। ফলে, কোনির পরিবার থেকে হারিয়ে যায় সুখের কলরোল। শ্যামপুকুর বস্তির চালার ঝুপড়ি ঘরে নেমে আসে বিষন্নতা। হতাশার বেনোজলে স্বপ্নের ফেরিওয়ালা হয়ে আসে সাঁতার প্রশিক্ষক ক্ষিতীশ সিংহ।

প্রথাগত ভাবে সাঁতারে আসার আগে, কোনি গঙ্গায় সাঁতার কেটে আম কুড়োত আর পয়সা উপার্জনের আশায় সেই আম বাজারে বেচতো । সামান্য ফ্যান ভাত, তেঁতুল, কাঁচা লঙ্কা আর কাঁচা পেঁয়াজ খেয়েই জীবন ধারণ করতো। থাকতো অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ছোট্ট একটা ঘরে। কিন্তু কমলের মৃত্যুর পর, কোনিদের অবস্থা আরো সঙ্গীন হয়ে পড়ে । ছোট ভাই পনেরো টাকা মাইনেতে চায়ের দোকানে কাজ করতে লেগে পড়ে । কোনি চল্লিশ টাকা মাইনেতে ক্ষিতিশের স্ত্রী লীলাবতীর টেলারিং শপ, 'প্রজাপতি[3] ' তে ফাইফরমাশ খাটতে থাকে আর কমলের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখতে যে সে ভারত সেরা সাঁতারু হয়ে উঠবে, কোনি কমল দীঘির জলে স্বপ্নের ঢেউ তোলে[4] । ক্ষিতিশের বদান্যতায় কোনির পরিবার কমলের অনুপস্থিতিতে মুখে ভাতটুকু তুলতে পারে । দু-টাকার ডিম, কলা, টোস্টের জন্য লালায়িত কোনি ও তার যৌথ পরিবারকে ক্ষিতীশ নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল। এভাবেই উপন্যাসে কোনির বেদনাদীর্ণ পারিবারিক জীবনের চালচিত্র ফুটে উঠেছিল[5] ।

'কোনি' উপন্যাসে কোনির 'ক্ষিদ্দা' ওরফে ক্ষিতীশ সিংহ আগাগোড়া ছিলেন এক ব্যতিক্রমী মানুষ। সাধারণ এক দরিদ্র পরিবারের মেয়েকে নিজের একগুঁয়েমি নিষ্ঠা ও অধ্যাবসায়কে পাথেয় করে কোনির কাঙ্খিত উচ্চতায় উত্তরনের পিছনে যে মানুষটির অবদান অনস্বীকার্য তিনি হলেন কোনির ক্ষিদ্দা। প্রতিভাকে চিনে নিয়ে তাকে সুশৃংখল প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে চালনা করতে যে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, তা ক্ষিতীশের ছিল। ক্ষিতীশ দেশের জন্য গৌরব এনে দেওয়া একজন খেলোয়াড় তৈরি করতে জলের মতো অর্থ ব্যয়

করেছেন। কোনিকে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কেবল একজন সুযোগ্য খেলোয়াড় তৈরির জন্য। নিজে রোজগার বা অন্য কোন স্বার্থের জন্য নয়। নিজের সংসারে অভাব থাকা সত্ত্বেও তিনি কোনির খাওয়া-দাওয়া ও ঘুমের দায়িত্ব নিয়েছেন । কোনিকে অনিচ্ছাকৃত হলেও তাকে দিয়ে প্রবল পরিশ্রম করিয়েছেন । আবার বড় দাদার মতো তাকে চিড়িয়াখানায় কুমীর দেখাতে নিয়ে গিয়েছেন । যে ক্ষিদ্দা কোনি কেঁদে ফেললেও প্র্যাকটিস থেকে রেহাই দেননি । খাওয়ার টোপ দিয়ে সাঁতার কাটানোর মতো অমানবিক আচরণ করেছেন । তিনিই আবার কোনি ঘুমিয়ে পড়লে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছেন। ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে কোনি নিজেকে প্রমাণ করার পর তার মাথার উপর ঝরে পড়েছে তার আনন্দাশ্রু।

ফাইট কোনি, ফাইটঃ কোনি উপন্যাসে আত্মপ্রতিষ্ঠায় এক মুল মন্ত্র

ফাইট কোনি, ফাইট শব্দটি কোনি উপন্যাসের একেবারে ক্লাইমেক্স এর মুহূর্তের এক বহিঃপ্রকাশ। যার সূত্রপাত হয়েছিল গঙ্গা নদীতে আম কুড়ানোর নেশায় যখন একদল ছেলে মেয়েদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হত, কে আমের সত্ত্বাধিকারী হবে? সেখান থেকে। গঙ্গায় যে আম কুড়ানোর প্রতিযোগিতা চলত তা ছিল জীবন ধারনের জন্য কোনও ভাবে আনন্দ উপভোগের জন্য নয়। লেখক তাঁদের সেই প্রাথমিক প্রতিযোগিতাকে লিপি বদ্ধ করেছেন এই ভাবে ''*... হঠাৎ ওদের একজন একটু একটু করে এগিয়ে যেতে শুরু করল, অন্য দুজনকে পেছনে ফেলে। তখনই চিৎকার উঠল - কো ও ও ও ... নি ই ই ই। কো ও ও ও ... নি ই ই ই। পিছনে পড়া দুজনের গতি আরও বাড়ল।*[6] ° শুধু তাই নয় যখন একই আম নিয়ে দুই বা ততোধিক ছেলেমেয়েদের মধ্যে ঝামেলার সৃষ্টি হত তখন তা মারপিটে গিয়ে শেষ হত , যার প্রকিষ্ঠ উদাহারন এই লেখার মধ্যেই পায়- *'এই ভাদু, এই আম 'কোনি'র। বার করে দে। নয়তো সত্যই চোখ তুলে নেবে কিন্তু''*[7] । তাঁদের এই প্রতিযোগিতা প্রকৃত পক্ষে অস্তিত্ত রক্ষার সংগ্রাম, আর এরই ফলস্বরূপ বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁরা আর সংগ্রামী হয়ে উঠে, পরিবর্তন করার চেষ্টা করে সমাজে চলতে থাকা সমস্ত বৈষম্য নীতিগুলির। কোনিও এক দীর্ঘ অধ্যাবসায়ের ফল হিসেবে ক্রীড়া জগতে যে ধরনের বৈষম্য নীতিগুলি বিরাজ করেছিল, সেগুলির প্রতিবাদ জানিয়ে ছিল।

কোনি উপন্যাসের 'ফাইট কোনি, ফাইট' এই আপ্ত বাক্যটি মনে পড়লে, চোখের সামনে ভেসে উঠে এক জীবন যুদ্ধে হার না মানা একটি গ্রাম্য মুখ। এখানে "কোনি" উপন্যাসে কোনি ও তার সাঁতার প্রশিক্ষক ক্ষিতীশ সিংহের ঘাত - প্রতিঘাত যুক্ত সংঘর্ষ - সংকুল জীবনের ক্রমউত্থানের কাহিনি । জুপিটার ক্লাবের সদস্যরা চক্রান্ত করে ক্ষিতীশকে চিফ ট্রেনারের পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করায় । এবং, এমন এক সময়ে কোনিকে আবিষ্কার করেন ক্ষিতীশ যে তাঁর পক্ষে যেন ব্যায়ভার বহন করা ও সাঁতারের উপযুক্ত ব্যাবস্থা করাও ছিল প্রায় এক প্রকার দুরহ ব্যাপার কিন্তু ক্ষিতীশ ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। কোনি পিতৃহীন, অপরদিকে ক্ষিতীশ সন্তানহীন যা তাঁদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছুটা হলেই স্বস্তি এনে দিয়েছিল, যদিও সব কিছুই কিন্তু ক্রীড়াকেন্দ্রিক; বহু খোঁজার পর এতদিনে ভাগ্যবিড়ম্বিত ক্ষিতীশ উপযুক্ত শিষ্যা পান । প্রচণ্ড পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ কোনিকে এনে দেয় সাফল্য; আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পিতৃপ্রতিম ক্ষিতীশ সিংহের প্রশিক্ষণ । হিয়া মিত্র , অমিয়া , রমা যোশী প্রমুখ বাংলা ও বাংলার বাইরের সমস্ত দক্ষ সাঁতারুকে পরাস্ত করে কোনি ।জয়ী হয় কোনি; জয়ী হয় ক্ষিতীশ; জয়ী বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা এক শ্রেণির মানুষ। কোনির কানে নিরন্তর অনুপ্রেরণার বাণী রচিত হয় —— " ফাইট কোনি , ফাইট " যা তাকে ক্রীড়া ক্ষেত্রে আত্ম প্রত্যয়ের এক বীজ বপন করেছিল।

সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পেছনে ক্রীড়ার ভুমিকা প্রসঙ্গ কোনি উপন্যাস

প্রতিষ্ঠিত শব্দটি বর্তমান সমাজে এক বৃহৎ অর্থ বহন করে, কেননা প্রতিষ্ঠিত অর্থটি ব্যাক্তি ও সময় বিশেষে এর পরিবর্তন ঘটে। যার অন্যতম উদাহারন হল ক্রীড়া ক্ষেত্র, যেখানে মানুষ নিজেকে বিভিন্ন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এই প্রবন্ধ্যের মধ্যে দেখানোর খেলাধুলা যে মানুষ কে মাথা তুলে বাঁচতে সেখায়, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শেখায়, ঠিক বা ভুলের পার্থক্য বুঝতে শেখায় সেই দৃষ্টিকোণটি যা আমরা অনেক আগেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি। এই আলোচনায় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে কিভাবে কোনি এক হতদরিদ্র্য পরিবারের সন্তান হয়েও, বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা কে অতিক্রম করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিল। কিভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিল তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যখন তাকে বিনা দোষে চোর অপবাদ সইতে হয়েছিল এবং ঠিক তার পরে পরেই তার প্রমান হাতে নাতে পায় তখনই কোনি এক চড়ে সেই প্রতিবাদ ফিরিয়ে দেয় এই বলে... *"এটা তোমার পাওনা ছিল। বেলাদিকে জিজ্ঞাস করো, জানতে পারবে। তোমার জন্যই আমি আজ চড় খেয়েছি, চোর বাদনাম পেয়েছি*[8]' । কোনি একটু থেমে আবার বলল, " *তোমাকে আমি একটুও হিংসা করি না। আমি বস্তির মেয়ে, লেখা পড়াও জানিনা, তোমার সঙ্গে পারব কেন। তবে একবার কখনো যদি জলে পাই...*"[9] পিতৃহীন কোনির একমাত্র রুটি রোজগারের একমাত্র উপায় ছিল তার দাদা, কিন্তু তাতে তাঁদের সংসার স্বাভাবিক ভাবে চলা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। তাই বাধ্য হয়েই কোনি ও গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে আম কুড়িয়ে বাজারে বিক্রি করে সামান্য উপার্জনে মনোনিবেশ করেছিল। তাঁদের গঙ্গা নদীতে আম কুড়ানোকে লেখক এই ভাবে দেখিয়েছেন... "*ছোট ছোট দলে ছেলেরা জলে অপেক্ষা করে আছে আম সংগ্রহের জন্য। কেউ গলা জলে দাড়িয়ে, কেউ বা দূরে ভেসে রয়েছে। আম দেখলেই হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। একসঙ্গে দু তিন জন চিৎকার করতে করতে জল তোলপাড় করে এগিয়ে যায়। যে পায় সে প্যান্টের পকেটে রেখে দেয়, পকেটে আম ভরে গিয়ে ফুলে উঠলে জল থেকে ঘাটের উপর কোথাও রেখে আসে। সেই আমে হাত দেবার সাধ্য কারো নেই। পরে আম গুলো বিক্রি করে পথের ধারে বসা বাজারে, অনেক কম দামে*"[10]।

উক্ত লাইনটি 'কোনি' উপন্যাসের দ্বিতীয় প্যারা থেকে নেওয়া হয়েছে, এটি নিছক কোন একটি সাধারন লাইন নয়, এটি জীবন সংগ্রামের এক জীবন্ত দলিল। কেননা যে বয়সে বাচ্চারা আনন্দ উপভোগ ও পড়াশুনার মধ্যে ডুবে থাকার কথা, সেখানে 'কোনি' উপন্যাসে ছেলেরা জলে ডুব দিচ্ছে সংসারের গুরু দায়িত্ব নিয়ে, অর্থ উপার্জনের একটি পন্থা হিসেবে, কেননা কোনও রকম ইনভেস্ট ছাড়াই এটিই ছিল 'কোনি' উপন্যাসের ছেলে মেয়েদের কাছে এক প্রধান উপার্জনের পথ । যেখানে কম দামে জনসাধারণ ও একই দ্রব্য কিনতে পারত[11]। কোনি উপনাস্যের প্রধান চরিত্র কোনি সত্যই এক সংগ্রামী, হার না মানা দারিদ্রতাকে সঙ্গী করে এগিয়ে যাওয়া এক শক্তির প্রতিভু। যার মধ্যেই অর্থাভাব ও অসন্তোষ নিজেকে কুরে কুরে খাচ্ছিল বার বার, তা সত্ত্বেও তার দাদার জেদ ও পরবর্তীকালে মাস্টার মশায়ের অন্তরিক ও শর্তহীন ভালবাসা সর্বোপরি কোনির অক্লান্ত পরিশ্রম ও অদম্য চেষ্টা তাকে গঙ্গা নদীতে আম কুড়ানি থেকে খেলার জগতে এক বিশিষ্ট নাম হয়ে উঠেছিল। তবে তার এই যে উত্তরণ কোনও ভাবেই কিন্তু কুসুমাতীর্ণ ছিল না, ছিল কণ্টকাকীর্ণ , যেমন তাকে সমাজের অবহেলা, বঞ্চনা, আপমান প্রভতি সহ্য করতে হয়তে হয়েছিল।

ক্রীড়া জগতে মহিলাদের অন্তর্ভুক্তি উপনিবেশিক ভারতে সেভাবে লক্ষ্য করা না গেলেও উপনিবেশিক পরবর্তী সময়ে যথেষ্ট উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এবং পরবর্তী সময় থেকে ক্রীড়া জগতে আন্তর্জাতিক

ক্ষেত্রে বরাবরই মহিলারা ভারতের নাম উজ্জ্বল করেছেন। দলগত খেলা থেকে ব্যাক্তিগত বিভাগের খেলা - সব জায়গাতেই ভারতীয় মহিলা ক্রীড়াবিদদের দাপট দেখা গিয়েছে। সেই গত শতাব্দীর নয়ের দশকে পিটি উষা থেকে শুরু করে এখনকার দিনের সানিয়া, সাইনা, সাক্ষী, দীপা, হিমা প্রমুখ - তালিকাটা অনেক লম্বা হতে পারে। শেষ অলিম্পিকেও যদি দেখা যায়, পদক জিতেছিলেন দুই মহিলা ক্রীড়াবিদ - সাক্ষী মালিক[12] ও পিভি সিন্ধু[13]। আর আরেকজন দীপা কর্মকার, ফিরেছিলেন পদকের খুব কাছ থেকে। কিন্তুখেলাধূলার , - পারিবারিক ,জগতে মেয়েদের আসার পথটা মোটেই সহজ নয়। আর্থিক বাধার সঙ্গে থাকে সামাজিক আরও অনেক বড় কিছু। ,একটা পদক নয় বহুবিধ বিপত্তি। সেই সব অতিক্রম করে তাদের জয় তাই শুধু ভারতের মহিলা ক্রীড়াবিদদের অনেকেই এই দেশের খেলাধূলার মানচিত্রটাই বদলে দিয়েছেন। হইতও সেই যে বদল বা পরিবর্তন কোনির ক্ষেত্রে ঘটেনি অথবা এ কথা বলতে দ্বিধা নাই যে খেলার ক্ষেত্রে যে পারফর্মেন্স এর উপরেই সব কিছু নির্ভর নিধারিত হতো তা কিন্তু নই। কেননা কোনি গরীব পরিবারের বলে তার ক্ষেত্রে খেলার জগতে যে সব বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তার পরেও তাঁর সফলতার কাহিনি সত্যই বেশ প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয়।

কোনি উপন্যাস প্রসঙ্গে স্বাধীন চিন্তা, সিধান্ত ও মত প্রকাশে খেলাধুলার ভুমিকা:

'চ্যাম্পিয়ন তারা নয় যারা একবার খেলার মাঠে জয়ী হয়েই থেমে যায়। বরং তারাই প্রকৃত চ্যাম্পিয়ন যারা হারের পর হার সহ্য করে শুধুমাত্র খেলায় জেতার জন্য'। এই লাইন দুটির মর্মার্থ খুবই গভীর, এ কথা সত্য যে খেলাধুলার যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে তার মধ্যে সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হল খেলাধুলা কেবল জেতা শেখায় না, হারের পর আত্মসমালোচনার পথ ও উন্মুক্ত রাখতে সাহায্য করে খেলাধুলা। খেলার মধ্যেই খুঁজে পায় মাথা তুলে সৎ কথা সহজ ভাবে জনসমক্ষে বলার সাহস, খুঁজে পায় বিক্ষিপ্ত সমাজকে একই ছাদের তলায় ঐক্যবদ্ধ করার এক দারুন সুযোগ। কিন্তু খেলাধুলা তার যে নিজস্ব পরিধি আছে, তা থেকে অনেকটা আমরা বেরিয়ে এসেছি, কেননা সমাজ সচেতনতার এক বৃহৎ ফাঁক যে এখন সম্পূর্ণ ভাবে মেরামত করা হয়ে উঠেনি। আর এই প্রসঙ্গে পিতা মাতা, সমাজ ও সংস্কৃতির যে এক বৃহৎ প্রেক্ষাপট আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। একথা বলতে কোন দ্বিধা নাই যে বর্তমানে পিতামাতারা তাদের সন্তানের জীবনে সিদ্ধান্ত নেওয়ায় এক বিশেষ ভুমিকা পালন করে আসছে, সেই বাচ্ছা বেলা থেকেই পিতামাতার বেশির ভাগ না পুরন হওয়া স্বপ্ন গুলোই তাঁদের উপর চাপিয়ে এক বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যদিও কিছু ব্যাতিক্রমি চিত্র ও আছে। ব্রিটিশ পূর্ব ভারতে খেলাধুলার ইতিহাস ছিল না, ছিল কেবল মাত্র নিজস্ব ঘরানায় কিছু ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলার অস্তিত। বিশেষত স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে, ভারতীয় বাবা-মা শিক্ষাবিদদের এবং তাদেরকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন যেখানে খেলাধুলাকে একটি 'টাইম পাস' ক্রিয়াকলাপ হিসাবে বিবেচনা করা হত বা কেবল বিনোদনমূলক উদ্দেশ্যে। খেলাধুলা কখনও ছিল না বেশিরভাগ পিতা-মাতা এবং তাদের বাচ্চাদের জন্য অগ্রাধিকার। আসলে এখানে হিন্দি ভাষায় একটি গানের পঙক্তি খুবই মনে পড়ে -: "খেলোগী কুদগে তো হঙ্গে খারাব, পড়েঙ্গে লিখঙ্গে তো হঙ্গে নবাব" যার অর্থ 'খেললে তুমি খারাপ হয়ে যাবে, পড়লে লিখলে নবাব হয়ে যাবে[14]'। যেখানে একবিংশ শতাব্দীতেও সমজের বেশির ভাগ মানুষের মধ্যেই খেলাধুলা কেবল আনন্দ বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে দেখছে। যদিও বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে লাভজনক ও বৃহৎ শিল্পের মধ্যে গন্য করা হচ্ছে, তবে বেশির বেশির মানুষই কেবল মাত্র আবসর বিনোদনের মাধ্যাম হিসেবে খেলাধুলাকে দেখে। যদিও আবার খুব কম সংখ্যক মানুষ

খেলাকে পেশা হিসবে গ্রহণ করছে, বেছে নিচ্ছে বেঁচে থাকার একটি বিশেষ উপকরণ হিসেবে বা আত্মপ্রতিষ্ঠা, স্বাধীন মত প্রকাশের এক অনন্য মাধ্যাম হিসেবে।

শিক্ষা যে সমাজ ও চরিত্র গঠনের এক অন্যতম মাধ্যম তা আমরা প্রথম থেকেই জেনে আসছি[15]। খেলাধুলা ও চরিত্র গঠন একই মুদ্রার এপিট ওপিট সে বিষয়ে সকলেই এক মত। কেননা খেলাধুলা সংগঠিত হয় অনেকগুলি শাসন ও অনুশাসনের মধ্য দিয়ে। অনুরূপ ভাবে আলোচ্য উপন্যাসে, কোনিকেও তাঁর সাঁতারের জন্য বেশ কয়েকটি আইন বা পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়েছিল। আর এই আইন গুলিই একজন খেলোয়াড়ের জীবনে এনে দেয় পরিবর্তনের এক চূড়ান্ত পর্যায়। এই গল্পের প্রধান চরিত্র কোনি ও নিজের স্বাভাবিক যে জীবন, তা থেকে ধীরে ধীরে পরিবর্তন করে নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়া, ঘুমানো বা প্র্যাকটিস করা সবই তাকে করতে হতো। দলগত খেলাগুলি খেলার সময় এক ধরনের সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সম্প্রীতি প্রভৃতি মাধ্যমে গড়ে ওঠে ' টিম স্পিরিট[16] ' যদিও কোনি তা কখনই উপলব্ধিই করতে পারে নি, উপরন্তু সে উপলব্ধি করে ছিল কি ভাবে প্রতি পদে পদে সমাজের তীক্ষ্ণ থাবা তার দিকে ধেয়ে আসছে, বিভিন্ন অসহযোগিতা ও অসহমর্মিতার কটূক্তি তাঁর দিকে ছুঁড়ে ছোট করা হচ্ছে। দলগত খেলার মধ্য দিয়ে খেলোয়াড়দের মনে সুগঠিত হয় এক কার্যকরী আত্মীয়তাবোধ, যা কোনি পেয়েছিল একমাত্র **ক্ষিদ্দা**র কাছ থেকে। খেলাধুলার দ্বারা সাম্প্রদায়িকতা, বিভেদ, বৈচিত্র, ধর্ম সব কিছুকে ভুলে তারা মেতে ওঠে আনন্দের উৎসবে, সমাজকে এক নতুনের বাণী শোনায়, তা হইত কোনি কস্মিনকালেও উপলব্ধি করতে পারিনি ঠিকই কিন্তু অন্য দিকে সে এটা সহজেই উপলব্ধি করেছিল যে খেলাধুলার মধ্যেও বৈষম্য অনেক সময় বিরাজ করে না। খেলার মধ্যে প্রগাঢ় হয় সংহতি, সম্প্রীতি, ঐক্য, জাতীয়তাবোধ ও সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন। এরই প্রভাবে মানব চরিত্র সংকীর্ণতার আবরণ ছিন্ন করে আরোহন করে মানবিকতার অনল শিখরে। কিন্তু কোনির ক্ষেত্রে ঘটেছিল ঠিক এর বিপরীত অবস্থা, যেখানে যে গরিব হওয়ার কারনে ক্ষিদ্দা ব্যাতিত প্রত্যকের কাছেই অবাঞ্ছিত হয়েই থেকে গিয়ে ছিল, তাঁর খেলার সঙ্গী থেকে কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত।

উপসংহার: একথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নাই যে, ব্যক্তির চরিত্র গঠনে ও খেলাধুলার ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। খেলাধুলার মাধ্যমে মানুষের চরিত্রে দৃঢ়তা আসে। খেলাধুলা করতে ধৈর্য ও সংযম উভয়েরই প্রয়োজন হয়। ফলে যারা খেলাধুলা করে তাদের ব্যক্তিগত জীবনে ও চরিত্রের মধ্যে এই দুটির ছাপ পড়ে। খেলাধুলায় জয়ের আনন্দ থাকে আবার পরাজয়ের গ্লানি থাকে এবং ফলাফল যেটাই হোক মানুষ সেটাই মানতে বাধ্য থাকে। এর ফলে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনেও যেকোনো বিষয়ে জয়-পরাজয় সহজভাবে মেনে নেয়ার মানসিকতা তৈরি হয়। যে ব্যক্তি খেলাধুলার সময় সৎ থাকে, অন্যকে ধোঁকা দেওয়া থেকে বিরত থাকে, ব্যক্তিগত জীবনেও সেই ব্যক্তি সৎ হয়। খেলাধুলার মাধ্যমে ব্যক্তির চরিত্রে আত্মবিশ্বাস, দৃঢ় প্রত্যয়, অধ্যবসায়ের মতো মানসিক গুণাবলীগুলো যুক্ত হয়। এর ক্ষেত্রে কোনির যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে সেখানে খেলাধুলার মধ্যে কোনি হয়ে উঠেছে এক আগুনে পোড়ানো চকচকে হিরে। কেননা ক্রমাগত লাঞ্ছনার গ্লানিই তাকে কর্তবে অনড় ও অবিচল থাকতে সাহাজ্য করেছিল।

খেলাধুলার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন তৈরি হয়। খেলাধুলা করতে গিয়ে একজন আর একজনের সাথে খেলতে হয়। অন্যের সাহায্য নিতে হয়, অন্যের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হয়। দলের একজন খেলোয়াড়ের উপর অন্যজনের নির্ভরতা থাকে। খেলার মধ্যে সৃষ্ট পরস্পরের প্রতি এই আস্থা, বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্যতা মানুষের ভেতরে সম্পর্ক তৈরি করে। সেই সম্পর্ক সহযোগিতার, সৌহার্দ্যরে ও

সম্প্রীতির। খেলাধুলা যে শুধুমাত্র খেলোয়াড়দের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন তৈরি করে তা নয়। বরং খেলার দর্শক সমর্থকদের মধ্যেও এক ধরণের সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি করে। কিন্তু কোনির ক্ষেত্রে ঘটেছিল ঠিক তাঁর বিপরীত, তাকে সহ্য করতে হতো বাকা মুখের একরাশ অট্টহাস্যের হাসি, একাকিত্তের এক বিষম মুহূর্ত, ব্যর্থতার গ্লানি, নিঃসঙ্গতায় সমাজের প্রতি অনাস্থা।

তথাপি এ কথা সত্য যে মানুষ চরম অসহতার সময় মাত্র কয়েকটি পথ দেখতে পায় যার প্রথমটি হল আত্মহত্যা করে সমাজ থেকে নিজেকে মুক্তির পথে উন্নিত করা, অন্য দিকে আত্মহত্যার পথ ব্যাতিরেখে সম্পূর্ণ ভাবে নিজের জেদ ও অধ্যাবসায়কে কাজে লাগিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে শপথ গ্রহন করা 'আমি পারবই, আমাকেই করতে হবে, আমাকে বাঁচতেই হবে, সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতেই হবে' । যদিও প্রথম পথটি কখনই কাম্য নই, আবার অন্য দিকে দ্বিতীয় পথটি কণ্টকাকীর্ণ হলেও, সেটিই শ্রেয়। 'কোনি' উপন্যাসে, 'কোনি' কিন্তু বাঁচার তাগিদে দ্বিতীয় পথটি অনুসরণ করেছিলেন। 'কোনি' এক অসম যুদ্ধের সঙ্গে লড়াই প্রমান করেছিল অবহেলিত মানুষের প্রতি সমাজের দৃষ্টিকোণ, তবে খেলার মধ্যে দিয়ে 'কোনি' শেষ পর্যন্ত নিজেকে সমাজের চোখে নিজেকে প্রমান করেছিলেন যে উদ্দেশ্য সঠিক থাকলে খেলার দ্বারা ও সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তাই খেলার গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে রেডফিল্ড জেমিসনকে সমর্থন করে এ কথা বলা যেতেই পারে যে *'বাচ্চাদের স্বাধীনতা ও খেলার সময় দুটোই দেয়া উচিত। খেলাধুলা কোনো বিলাসীতা নয় বরং এটা প্রয়োজনীয়তা'*।

সূত্র নির্দেশ:

[1] *দুই বিঘা জমি,* কথা ও কাহিনী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[2] কোনি, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, চতুর্থ সংস্করণ, পৃষ্টা ২৫।
[3] প্রশিক্ষক ক্ষিতীশ সিংহের স্ত্রী লীলাবতী দুজন ডিপ্লোমাধারী মেয়েদেরকে নিয়ে একটি টেলরিং এর দোকান খুলেন, যার নাম দিয়েছিলেন 'প্রজাপতি'
[4] কোনি, পৃষ্টা ১০
[5] ঐ
[6] ঐ, পৃষ্ঠা ৬
[7] ঐ, পৃষ্ঠা, ৭।
[8] ঐ, পৃষ্ঠা ৬৩
[9] ঐ, পৃষ্ঠা ৬৩
[10] ঐ, পৃষ্ঠা ১
[11] কোনি উপন্যাসে উল্লেখিত যে গঙ্গায় আম কুড়িয়ে ছেলে মেয়েরা রাস্তার দু ধারে বসত সেগুলিকে বিক্রি করার জন্য, সেখান থেকে যা সামান্য উপার্জন করা হতো তা দিয়ে তাঁরা বাড়িতে সাহায্য করত।
[12] Business Today.in, https://www.businesstoday.in/lifestyle/off-track/story/woman-wrestler-sakshi-malik-wins-india-its-first-olympics-medal-146486-2016-08-18
[13] https://www.firstpost.com/sports/on-this-day-pv-sindhu-becomes-first-indian-shuttler-to-win-world-championships-gold-8751111.html
[14] M.S. Dhoni: The Untold Story, Dircted by Neeraj Pandey.

[15] *Sports, Youth and Character: A Critical Survey*, Robert K. Fullinwider, Institute for Philosophy & Public Policy University of Maryland, Circle Working Paper 44 February 2006

[16] https://sportsaspire.com/how-does-sports-build-team spirit#:~:text=The%20reason%20for%20this%20is,won%20alone%20by%20the%20player.